কার্তিক, ১৩১৪

র বী ন্দ্র না থ ঠা কু র

গুপ্তধন

১

অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি। মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিক মতে তাহাদের বহুকালের গৃহদেবতা জয়কালীর পূজায় বসিয়াছে। পূজা সমাধা করিয়া যখন উঠিল তখন নিকটস্থ আমবাগান হইতে প্রত্যুষের প্রথম কাক ডাকিল।

মৃত্যুঞ্জয় পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন মন্দিরের দ্বার রূদ্ধ রহিয়াছে। তখন সে একবার দেবীর চরণতলে মস্তক ঠেকাইয়া তাঁহার আসন সরাইয়া দিল। সেই আসনের নীচে হইতে একটি কাঁঠালকাঠের বাক্স বাহির হইল। পৈতায় চাবি বাঁধা ছিল। সেই চাবি লাগাইয়া মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিল। খুলিবামাত্রই চমকিয়া উঠিয়া মাথায়ে করাঘাত করিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের অন্দরের বাগান প্রাচীর দিয়া ঘেরা । সেই বাগানের এক প্রান্তে বড়ো বড়ো গাছের ছায়ার অন্ধকারে এই ছোটো মন্দিরটি। মন্দিরে জয়কালীর মূর্তিছাড়া আর -কিছুই নাই ;তাহার প্রবেশদ্বার একটিমাএ। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিবার পূর্বে তাহা বন্ধই ছিল-কেহ তাহা ভাঙে নাই। মৃত্যুঞ্জয় দশবার করিয়া প্রতিমার চারি দিকে ঘুরিয়া হাতড়াইয়া দেখিল-কিছুই পাইল না। পাগলের মতো হইয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ফেলিল- তখন ভোরের আলো ফুটিতেছে। মন্দিরের চারি দিকে মৃত্যুঞ্জয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃথা আশ্বাসে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। সকালবেলাকার আলোক যখন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল তখন সে বাহিরের চন্ডীমন্ডপে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর ক্লান্তশরীরে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিল, " জয় হোক বাবা। "

সম্মুখে প্রাঙ্গণে এক জটাজূটধারী সন্ন্যাসী । মৃত্যুঞ্জয় ভক্তিভরে তাহাকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা তুমি মনের মধ্যে বৃথা শোক করিতেছ।" শুনিয়া মৃত্যুঞ্জয় আশ্চর্য হইয়া উঠিল-- কহিল, "আপনি অন্তর্যামী, নহিলে আমার শোক কেমন করিয়া বুঝিলেন। আমি তো কাহাকেও কিছু বলি নাই।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস, আমি বলিতেছি, তোমার যাহা হারাইয়াছে সেজন্য তুমি আনন্দ করো, শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, " আপনি তবে তো সমস্তই জানিয়াছেন- কেমন করিয়া হারাইয়াছে, কোথায় গেলে ফিরিয়া পাইব , তাহা না বলিলে আমি আপনার চরণ ছাড়িব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি যদি তোমার অমঙ্গল কামনা করিতাম তবে বলিতাম। কিন্তু ভগবতী দয়া করিয়া যাহা হরণ করিয়াছেন সেজন্য শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় সন্ন্যাসীকে প্রসন্ন করিবার জন্য সমস্তদিন বিবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করিল। পরদিন প্রত্যুষে নিজের গোহাল হইতে লোটা ভরিয়া সফেন দুগ্ধ দুহিয়া লইয়া আসিয়া দেখিল, সন্ন্যাসী নাই।

২

মৃত্যুঞ্জয় যখন শিশু ছিল, যখন তাহার পিতামহ একদিন এই চণ্ডীমন্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তখন এমনি করিয়াই একটি সন্ন্যাসী জয় হোক বাবা বলিয়া এই প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হরিহর সেই সন্ন্যাসীকে কয়েকদিন বাড়িতে রাখিয়া বিধিমত সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করিল। বিদায়কালে সন্ন্যাসী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, তুমি কী চাও, হরিহর কহিল, বাবা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমার অবস্থাটা একবার শুনুন। এককালে এই গ্রামে আমরা সকলের চেয়ে বর্ধিষ্ণু ছিলাম। আমার প্রপিতামহ দূর হইতে কুলীন আনাইয়া তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দৌহিত্রবংশ আমাদিগকেই ফাঁকি দিয়া আজকাল এই গ্রামে বড়োলোক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এখন অবস্থা ভালো নয়, কাজেই ইহাদের অহংকার সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু আর সহ্য হয়

না। কী করিলে আবার আমাদের বংশ বড়ো হইয়া উঠিবে সেই উপায় বলিয়া দিন, সেই আশীর্বাদ করুন।"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন ,"বাবা, ছোটো হইয়া সুখে থাকো। বড়ো হইবার চেষ্টায় শ্রেয় দেখি না।"

কিন্তু হরিহর তবু ছাড়িল না, বংশকে বড়ো করিবার জন্য সে সমস্ত স্বীকার করিতে রাজি আছে।

তখন সন্ন্যাসী তাঁহার ঝুলি হইতে কাপড়ে মোড়া একটি তুলট কাগজের লিখন বাহির করিলেন। কাগজখানি দীর্ঘ, কোষ্ঠীপত্রের মতো গুটানো। সন্ন্যাসী সেটি মেজের উপর খুলিয়া ধরিলেন। হরিহর দেখিল, তাহাতে নানাপ্রকার চক্রে নানা সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা ; আর সকলের নিম্নে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে, তাহার আরম্ভটা এইরূপ:

পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা।।
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা।।
তেঁতুল-বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে।।
ঈশান কোণে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী। ইত্যাদি

হরিহর কহিল," বাবা, কিছুই তো বুঝলাম না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, কাছে রাখিয়া দাও, দেবীর পূজা করো। তাহার প্রসাদে তোমার বংশে কেহ-না-কেহ এই লিখন বুঝিতে পারিবে। তখন সে এমন ঐশ্বর্য পাইবে জগতে যাহার তুলনা নাই।

হরিহর মিনতি করিয়া কহিল," বাবা কি বুঝিইয়া দিবেন না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "না। সাধনা দ্বারা বুঝিতে হইবে।"

এমন সময় হরিহর ছোট ভাই শংকর আসিয়া উপস্থিত হইলো। তাহাকে দেখিয়া হরিহর তাড়াতাড়ি লুকাইবার চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "বড়ো হইবার পথের দুঃখ এখন হইতেই শুরু হইল। কিন্তু গোপন করিবার দরকার নাই। কারণ, ইহার রহস্য কেবল একজনমাত্রই ভেদ করিতে পারিবে, হাজার চেষ্টা করিলেও আর কেহ তাহা পারিবে না। তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি যে কে তাহা কেহ জানে না । অতএব ইহা সকলের সম্মুখেই নির্ভয়ে খুলিয়া রাখিতে পারো।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কিন্তু হরিহর এ কাগজটি লুকাইয়া না রাখিয়া থাকিতে পারিল না। পাছে আর কেহ ইহা হইতে লাভবান হয়, পাছে তাহার ছোটো ভাই শংকর ইহার ফলভোগ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় হরিহর এই কাগজটি একটি কাঁঠালকাঠের বাক্সে বন্ধ করিয়া তাহাদের গৃহদেবতা জয়কালীর আসনতলে লুকাইয়া রাখিল। প্রত্যেক অমাবস্যায় নিশীথরাত্রে দেবীর পূজা সারিয়া সে একবার করিয়া সেই কাগজটি খুলিয়া দেখিত, যদি দেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অর্থবুঝিবার শক্তি দেন।

শংকর কিছুদিন হইতে হরিহরকে মিনতি করিতে লাগিল, "দাদা, আমাকে সেই কাগজটা একবার ভালো করিয়া দেখিতে দাও-না।"

হরিহর কহিল, "দূর পাগল। সে কাগজ কি আছে। বেটা ভণ্ডসন্ন্যাসী কাগজে কতকগুলো হিজিবিজি কাটিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল-- আমি সে পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।"

শংকর চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একদিন শংকরকে ঘরে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর হইতে সে নিরুদ্দেশ।

হরিহরের অন্য সমস্ত কাজকর্ম নষ্ট হইল-- গুপ্ত ঐশ্বর্যের ধ্যান এক মুহূর্ত সে ছাড়িতে পারিল না।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বড়ো ছেলে হ্যামাপদকে এই সন্ন্যাসীদত্ত কাগজখানি দিয়া

গেল।
এই কাগজ পাইয়া শ্যামাপদ চাকরি ছাড়িয়া দিল। জয়কালীর পূজায় আর একান্তমনে এই লিখনপাঠের চর্চায় তাহার জীবনটা যে কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিল না।
মৃত্যুঞ্জয় শ্যামাপদর বড়ো ছেলে। পিতার মৃত্যুর পরে সে এই সন্ন্যাসীদত্ত গুপ্তলিখনের অধিকারী হইয়াছে। তাহার অবস্থা উত্তরোত্তর যতই হীন হইয়া আসিতে লাগিল, ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত ঐ কাগজখানির প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট হইল। এমন সময় গত অমাবস্যারাত্রে পূজার পর লিখনখানি আর দেখিতে পাইল না-- সন্ন্যাসীও কোথায় অন্তর্ধান করিল।
মৃত্যুঞ্জয় কহিল, এই সন্ন্যাসীকে ছাড়া হইবে না। সমস্ত সন্ধান ইহার কাছ হইতেই মিলিবে।
এই বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে বাহির হইল। এক বৎসর পথে পথে কাটিয়া গেল।
৩
গ্রামের নাম ধারাগোল। সেখানে মৃতুঞ্জয় মুদির দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, আর অন্যমনস্ক হইয়া নানা কথা ভাবিতেছিল। কিছু দূরে মাঠের ধার দিয়া একজন সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। প্রথমটা মৃত্যুঞ্জয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। একটু পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যে লোকটা চলিয়া গেল এই তো সেই সন্ন্যাসী।
তাড়াতাড়ি হুঁকাটি রাখিয়া মুদিকে সচকিত করিয়া একদৌড়ে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে সন্ন্যাসীকে দেখা গেল না।
তখন সন্ধ্যা অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। অপরিচিত স্থানে কোথায় যে সন্ন্যাসীর সন্ধান করিতে যাইবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। দোকানে ফিরিয়া আসিয়া মুদিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ-যে মস্ত বন দেখা যাইতেছে, ওখানে কী আছে।"
মুদি কহিল, "এককালে ঐ বন শহর ছিল কিন্তু অগস্ত্য মুনির শাপে ওখানকার রাজা প্রজা সমস্তই মড়কে মরিয়াছে। লোকে বলে ওখানে অনেক ধনরত্ন আজও খুঁজিলে পাওয়া যায় ; কিন্তু দিনদুপুরেও ঐ বনে সাহস করিয়া কেহ যাইতে পারে না। যে গেছে সে আর ফেরে নাই।"
মৃত্যুঞ্জয়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি মুদির দোকানে মাদুরের উপর পড়িয়া মশার জ্বালায় সর্বাঙ্গ চাপড়াইতে লাগিল, আর ঐ বনের কথা, সন্ন্যাসীর কথা, সেই হারানো লিখনের কথা ভাবিতে থাকিল। বার বার পড়িয়া সেই লিখনটি মৃত্যুঞ্জয়ের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল, তাই এই অনিদ্রাবস্থায় কেবলই তাহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল--
পায়ে ধরে সাধা।
রাহা নাহি দেয় রাধা।।
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা।।
মাথা গরম হইয়া উঠিল-- কোনোমতেই এই কটা ছত্র সে মন হইতে দূর করিতে পারিল না। অবশেষে ভোরের বেলায় যখন তাহার তন্দ্রা আসিল তখন স্বপ্নে এই চারি ছত্রের অর্থ অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ হইল। 'রা নাহি দেয় রাধা' অতএব 'রাধা'র 'রা' না থাকিলে 'ধা' রহিল -- 'শেষে দিল রা' অতএব হইল 'ধারা' -- 'পাগোল ছাড়ো পা'-- 'পাগোল'-এর 'পা' ছাড়িলে 'গোল' বাকি রহিল-- অতএব সমস্তটা মিলিয়া হইল 'ধারাগোল' -- এ জায়গাটার নাম তো 'ধারাগোল'ই বটে।
স্বপ্ন ভাঙিয়া মৃত্যুঞ্জয় লাফাইয়া উঠিল।
৪
সমস্ত দিন বনের মধ্যে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় বহুকষ্টে পথ খুঁজিয়া অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয় গ্রামে ফিরিল।
পরদিন চাদরে চিঁড়া বাঁধিয়া পুনর্বার সে বনের মধ্যে যাত্রা করিল। অপরাহ্নে একটা দিঘির ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিঘির মাঝখানটা পরিস্কার জল আর পাড়ের গায়ে গায়ে চারি দিকে পথ আর

কুমুদের বন। পাথরে বাঁধানো ঘাট ভাঙিয়া-চুরিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে জলে চিঁড়া ভিজাইয়া খাইয়া দিঘির চারি দিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল।
দিঘির পশ্চিমপাড়ির প্রান্তে হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল একটা তেঁতুলগাছকে বেষ্টন করিয়া প্রকাণ্ড বটগাছ উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল--
তেঁতুল-বটের কোলে,
দক্ষিণে যাও চলে।।
দক্ষিণে কিছুদূর যাইতেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেখানে সে বেতঝাড় ভেদ করিয়া চলা একেবারে অসাধ্য। যাহা হউক, মৃত্যুঞ্জয় ঠিক করিল, এই গাছটাকে কোনোমতে হারাইলে চলিবে না।
এই গাছের কাছে ফিরিয়া আসিবার সময় গাছের অন্তরাল দিয়া অনতিদূরে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। সেই দিকের প্রতি লক্ষ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় এক ভাঙা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, নিকটে একটা চুল্লি, পোড়া কাঠ আর ছাই পড়িয়া আছে। অতি সাবধানে মৃত্যুঞ্জয় ভগ্নদ্বার মন্দিরের মধ্যে উঁকি মারিল। সেখানে কোনো লোক নাই, প্রতিমা নাই, কেবল একটি কম্বল, কমণ্ডলু আর গেরুয়া উত্তরীয় পড়িয়া আছে।
তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে ; গ্রাম বহুদূরে, অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া যাইতে পারিবে কি না, তাই এই মন্দিরে মনুষ্যবসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুশি হইল। মন্দির হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভাঙিয়া দ্বারের কাছে পড়িয়া ছিল ; সেই পাথরের উপরে বসিয়া নতশিরে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ পাথরের গায়ে কী যেন লেখা দেখিতে পাইল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল একটি চক্র আঁকা, তাহার মধ্যে কতক স্পষ্ট কতক লুপ্তপ্রায় ভাবে নিম্নলিখিত সাংকেতিক অক্ষর লেখা আছে--
এই চক্রটি মৃত্যুঞ্জয়ের সুপরিচিত। কত অমাবস্যা-রাত্রে পূজাগৃহে সুগন্ধ ধূপের ধূমে ঘৃতদীপালোকে তুলট কাগজে অঙ্কিত এই চক্রচিহ্নের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রহস্যভেদ করিবার জন্য একাগ্রমনে সে দেবীর প্রসাদ যাচ্ঞা করিয়াছে। আজ অভীষ্টসিদ্ধির অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ যেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে তীরে আসিয়া তরী দোবে, পাছে সামান্য একটা ভুলে তাহার সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, পাছে সেই সন্ন্যাসী পূর্বে আসিয়া সমস্ত উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়া থাকে, এই আশঙ্কায় তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এখন যে তাহার কী কর্তব্য তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল, সে হয়তো ঐশ্বর্যভাণ্ডারের ঠিক উপরেই বসিয়া আছে, অথচ কিছুই জানিতে পাইতেছে না।
বসিয়া বসিয়া সে কালীনাম জপ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল ; ঝিল্লির ধ্বনিতে বনভূমি মুখর হইয়া উঠিল।
৫
এমন সময় কিছুদূর ক্স বনের মধ্যে অগ্নির দীপ্তি দেখা গেল। মৃত্যুঞ্জয় তাহার প্রস্তরাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল আর সেই শিখা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।
বহুকষ্টে কিছুদূর গিয়া একটা অশথগাছের গুড়ির অন্তরাল হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার সেই পরিচিত সন্ন্যাসী অগ্নির আলোকে সেই তুলটের লিখন মেলিয়া একটা কাঠি দিয়া ছাইয়ের উপরে একমনে অঙ্ক কষিতেছে।
মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরের সেই পৈতৃক তুলটের লিখন ! আরে ভণ্ড, চোর ! এইজন্যই সে মৃত্যুঞ্জয়কে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছিল বটে !
সন্ন্যাসী একবার করিয়া অঙ্ক কষিতেছে আর একটা মাপকাঠি লইয়া জমি মাপিতেছে-- কিয়দ্দুর মাপিয়া হতাশ হইয়া ঘাড় নাড়িয়া পুনর্বার আসিয়া অঙ্ক কষিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।
এমনি করিয়া রাত্রি যখন অবসানপ্রায়, যখন নিশান্তের শীতবায়ুতে বনস্পতির অগ্রশাখার

পল্লবগুলি মর্মরিত হইয়া উঠিল, তখন সন্ন্যাসী সেই লিখনপত্র গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।
মৃত্যুঞ্জয় কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, সন্ন্যাসীর সাহায্য ব্যতীত এই লিখনের রহস্য ভেদ করা তাহার সাধ্য হইবে না। লুব্ধ সন্ন্যাসী যে মৃত্যুঞ্জয়কে সাহায্য করিবে না তাহাও নিশ্চিত। অতএব গোপনে সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি ছাড়া অন্য উপায় নাই। কিন্তু দিনের বেলায় গ্রামে না গেলে তাহার আহার মিলিবে না ; অতএব অন্ততকাল সকালে একবার গ্রামে যাওয়া আবশ্যক।
ভোরের দিকে অন্ধকার একটু ফিকা হইবামাত্র সে গাছ হইতে নামিয়া পড়িল। যেখানে সন্ন্যাসী ছাইয়ের মধ্যে আঁক কষিতেছিল সেখানে ভালো করিয়া দেখিল, কিছুই বুঝিল না। চতুর্দিকে ঘুরিয়া দেখিল, অন্য বনখণ্ডের সঙ্গে কোনো প্রভেদ নাই।
বনতলের অন্ধকার ক্রমে যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল তখন মৃত্যুঞ্জয় অতি সাবধানে চারি দিক দেখিতে দেখিতে গ্রামের উদ্দেশে চলিল। তাহার ভয় ছিল পাছে সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিতে পায়। যে দোকানে মৃত্যুঞ্জয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নিকটে একটি কায়স্থগৃহিণী ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া সেদিন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে প্রবৃত্ত ছিল। সেইখানে আজ মৃত্যুঞ্জয়ের আহার জুটিয়া গেল। কয়দিন আহারের কষ্টের পর আজ তাহার ভোজনটি গুরুতর হইয়া উঠিল। সেই গুরুভোজনের পর যেমন তামাকটি খাইয়া দোকানের মাদুরটিতে একবার গড়াইয়া লইবার ইচ্ছা করিল, অমনি গত রাত্রির অনিদ্রাকাতর মৃত্যুঞ্জয় ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।
মৃত্যুঞ্জয় স্থির করিয়াছিল, আজ সকাল-সকাল আহারাদি করিয়া যথেষ্ট বেলা থাকিতে বাহির হইবে। ঠিক তাহার উলটা হইল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে। তবু মৃত্যুঞ্জয় দমিল না। অন্ধকারেই বনের মধ্যে সে প্রবেশ করিল।
দেখিতে দেখিতে রাত্রি ঘনীভূত হইয়া আসিল। গাছের ছায়ার মধ্যে দৃষ্টি আর চলে না, জঙ্গলের মধ্যে পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয় যে কোন্‌ দিকে কোথায় যাইতেছে তাহা কিছুই ঠাহর পাইল না। রাত্রি যখন অবসান হইল তখন দেখিল, সমস্ত রাত্রি সে বনের প্রান্তে একই জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।
কাকের দল কা কা শব্দে গ্রামের দিকে উড়িল। এই শব্দ মৃত্যুঞ্জয়ের কানে ব্যঙ্গপূর্ণ ধিক্কারবাক্যের মতো শুনাইল।
৬
গণনায় বারম্বার ভুল আর সেই ভুল সংশোধন করিতে করিতে অবশেষে সন্ন্যাসী সুরঙ্গের পথ আবিস্কার করিয়াছেন। সুরঙ্গের মধ্যে মশাল লইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। বাঁধানো ভিত্তির গায়ে স্যাঁতলা পড়িয়াছে-- মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় জল চুঁইয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কতকগুলা ভেক গায়ে গায়ে স্তূপাকার হইয়া নিদ্রা দিতেছে। এই পিছল পথ দিয়া কিছুদূর যাইতেই সন্ন্যাসী দেখিলেন, সম্মুখে দেয়াল উঠিয়াছে, পথ অবরুদ্ধ। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেয়ালের সর্বত্র লৌহদণ্ড দিয়া সবলে আঘাত করিয়া দেখিলেন, কোথাও ফাঁকা আওয়াজ দিতেছে না, কোথাও রন্ধ্র নাই, এই পথটার যে এইখানেই শেষ তাহা নিঃসন্দেহ।
আবার সেই কাগজ খুলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে রাত্রি এমনি করিয়া কাটিয়া গেল।
পরদিন পুনর্বার গণনা সারিয়া সুরঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সেদিন গুপ্তসংকেত অনুসরণপূর্বক একটি বিশেষ স্থান হইতে পাথর খসাইয়া এক শাখাপথ আবিস্কার করিলেন। সেই পথে চলিতে চলিতে আবার এক জায়গায় পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।
অবশেষে পঞ্চম রাত্রে সুরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, "আজ আমি পথ পাইয়াছি, আজ আর আমার কোনোমতেই ভুল হইবে না।"
পথ অত্যন্ত জটিল ; তাহার শাখাপ্রশাখার অন্ত নাই-- কোথাও এত সংকীর্ণ যে গুঁড়ি মারিয়া

যাইতে হয়। বহু যত্নে মশাল ধরিয়া চলিতে চলিতে সন্ন্যাসী একটা গোলাকার ঘরের মতো জায়গায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই ঘরের মাঝখানে একটা বৃহৎ ইঁদারা। মশালের আলোকে সন্ন্যাসী তাহার তল দেখিতে পাইলেন না। ঘরের ছাদ হইতে একটা মোটা প্রকাণ্ড লৌহশৃঙ্খল ইঁদারার মধ্যে নামিয়া গেছে। সন্ন্যাসী প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া এই শৃঙ্খলটাকে অল্প একটুখানি নাড়িবামাত্র ঠং করিয়া একটা শব্দ ইঁদারার গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া ঘরময় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাইয়াছি।"

যেমন বলা অমনি সেই ঘরের ভাঙা ভিত্তি হইতে একটা পাথর গড়াইয়া পড়িল আর সেইসঙ্গে আর-একটি কী সচেতন পদার্থ ধপ্ করিয়া পড়িয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী এই অকস্মাৎ শব্দে চমকিয়া উঠিতেই তাহার হাত হইতে মশাল পড়িয়া নিবিয়া গেল।

৭

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে।" কোনো উত্তর পাইলেন না। তখন অন্ধকারে হাতড়াইতে গিয়া তাহার হাতে একটি মানুষের দেহ ঠেকিল। তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি।" কোনো উত্তর পাইলেন না। লোকটা অচেতন হইয়া গেছে।

তখন চকমকি ঠুকিয়া ঠুকিয়া সন্ন্যাসী অনেক কষ্টে মশাল ধরাইলেন। ইতিমধ্যে সেই লোকটাও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল, আর উঠিবার চেষ্টা করিয়া বেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "এ কী, মৃত্যুঞ্জয় যে ! তোমার এ মতি হইল কেন।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, " বাবা, মাপ করো। ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। তোমাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়া সামলাইতে পারি নাই-- পিছলে পাথরসুদ্ধ আমি পড়িয়া গেছি। পা-টা নিশ্চয় ভাঙিয়া গেছে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমাকে মারিয়া তোমার কী লাভ হইত।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "লাভের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ ! তুমি কিসের লোভে আমার পূজাঘর হইতে লিখনখানি চুরি করিয়া এই সুরঙ্গের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তুমি চোর, তুমি ভণ্ড ! আমার পিতামহকে যে সন্ন্যাসী ঐ লিখনখানি দিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদেরই বংশের কেহ এই লিখনের সংকেত বুঝিতে পারিবে। এই গুপ্ত ঐশ্বর্য আমাদেরই বংশের প্রাপ্য। তাই আমি এ কয়দিন না খাইয়া না ঘুমাইয়া ছায়ার মতো তোমার পশ্চাতে ফিরিয়াছি। আজ যখন তুমি বলিয়া উঠিলে 'পাইয়াছি' তখন আমি আর থাকতে পারিলাম না। আমি তোমার পশ্চাতে আসিয়া ঐ গর্তটার ভিতরে লুকাইয়া বসিয়া ছিলাম। ওখান হইতে একটা পাথর খসাইয়া তোমাকে মারিতে গেলাম, কিন্তু শরীর দুর্বল, জায়গাটাও অত্যন্ত পিছল-- তাই পড়িয়া গেছি। এখন তুমি আমাকে মারিয়া ফেলো সেও ভালো-- আমি যক্ষ হইয়া এই ধন আগলাইব--কিন্তু তুমি ইহা লইতে পারিবে না, কোনোমতেই না। যদি লইতে চেষ্টা কর, আমি ব্রাহ্মণ, তোমাকে অভিশাপ দিয়া এই কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। এ ধন তোমার ব্রহ্মরক্ত গোরক্ততুল্য হইবে-- এ ধন তুমি কোনোদিন সুখে ভোগ করিতে পারিবে না। আমাদের পিতা পিতামহ এই ধনের উপরে সমস্ত মন রাখিয়া মরিয়াছেন-- এই ধনের ধ্যান করিতে করিতে আমরা দরিদ্র হইয়াছি-- এই ধনের সন্ধানে আমি বাড়িতে অনাথা স্ত্রী ও শিশুসন্তান ফেলিয়া আহারনিদ্রা ছাড়িয়া লক্ষ্মীছাড়া পাগলের মতো মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি-- এ ধন তুমি আমার চোখের সম্মুখে কখনো লইতে পারিবে না।"

৮

সন্ন্যাসী কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, তবে শোনো। সমস্ত কথা তোমাকে বলি।

"তুমি জান, তোমার পিতামহের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম ছিল শংকর।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "হাঁ, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি সেই শংকর।"

মৃত্যুঞ্জয় হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এতক্ষণ এই গুপ্তধনের উপর তাহার যে একমাত্র দাবি

সে সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল, তাহারই বংশের আত্মীয় আসিয়া সে দাবি নষ্ট করিয়া দিল।
শংকর কহিলেন, "দাদা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে লিখন পাইয়া অবধি আমার কাছে তাহা বিধিমতে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যতই গোপন করিতে লাগিলেন, আমার ঔৎসুক্য ততই বাড়িয়া উঠিল। তিনি দেবীর আসনের নীচে বাক্সের মধ্যে ঐ লিখনখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহার সন্ধান পাইলাম, আর দ্বিতীয় চাবি বানাইয়া প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া সমস্ত কাগজখানা নকল করিতে লাগিলাম। যেদিন নকল শেষ হইল সেইদিনই আমি এই ধনের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আমারও ঘরে অনাথা স্ত্রী এবং একটি শিশুসন্তান ছিল। আজ তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই।
"কত দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছি তাহা বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসীদত্ত এই লিখন নিশ্চয় কোনো সন্ন্যাসী আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন এই মনে করিয়া অনেক সন্ন্যাসীর আমি সেবা করিয়াছি। অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী আমার ঐ কাগজের সন্ধান পাইয়া তাহা হরণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপে কত বৎসরের পর বৎসর কাটিয়াছে, আমার মনে এক মুহূর্তের জন্য সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না।
"অবশেষে পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের বলে কুমায়ুন পর্বতে বাবা স্বরূপানন্দ স্বামীর সঙ্গ পাইলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, 'বাবা, তৃষ্ণা দূর করো তাহা হইলেই বিশ্বব্যাপী অক্ষয় সম্পদ আপনি তোমাকে ধরা দিবে।'
"তিনি আমার মনের দাহ জুড়াইয়া দিলেন। তাঁহার প্রসাদে আকাশের আলোক আর ধরণীর শ্যামলতা আমার কাছে রাজসম্পদ হইয়া উঠিল। একদিন পর্বতের শিলাতলে শীতল সায়াহ্নে পরমহংস বাবার ধুনিতে আগুন জ্বলিতেছিল-- সেই আগুনে আমার কাগজখানা সমর্পণ করিলাম। বাবা ঈষৎ একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই, আজ বুঝিয়াছি। তিনি নিশ্চয় মনে মনে বলিয়াছিলেন, কাগজখানা ছাই করিয়া ফেলা সহজ কিন্তু বাসনা এত সহজে ভস্মসাৎ হয় না।
"কাগজখানার যখন কোনো চিহ্ন রহিল না তখন আমার মনের চারি দিক হইতে একটা নাগপাশবন্ধন যেন সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গেল। মুক্তির অপূর্ব আনন্দে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম এখন হইতে আমার আর-কোনো ভয় নাই-- আমি জগতে কিছুই চাহি না।
"ইহার অনতিকাল পরে পরমহংস-বাবার সঙ্গ হইতে চ্যুত হইলাম। তাঁহাকে অনেক খুঁজিলাম, কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না।
"আমি তখন সন্ন্যাসী হইয়া নিরাসক্তচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক বৎসর কাটিয়া গেল-- সেই লিখনের কথা প্রায় ভুলিয়াই গেলাম।
"এমন সময় একদিন এই ধারাগোলের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ভাঙা মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লইলাম। দুই-একদিন থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মন্দিরের ভিতে স্থানে স্থানে নানাপ্রকার চিহ্ন আঁকা আছে। এই চিহ্নগুলি আমার পূর্বপরিচিত।
"এতকালে বহুদিন যাহার সন্ধানে ফিরিয়াছিলাম তাহার যে নাগাল পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। আমি কহিলাম, 'এখানে আর থাকা হইবে না, এ বন ছাড়িয়া চলিলাম।'
"কিন্তু ছাড়িয়া যাওয়া ঘটিল না। মনে হইল, দেখাই যাক-না, কী আছে। কৌতূহল একেবারে নিবৃত্ত করিয়া যাওয়াই ভালো। চিহ্নগুলো লইয়া অনেক আলোচনা করিলাম ; কোনো ফল হইল না। বারবার মনে হইতে লাগিল, কেন সে কাগজখানা পুড়াইয়া ফেলিলাম। সেখানা রাখিলেই বা ক্ষতি কী ছিল।
"তখন আবার আমার সেই জন্মগ্রামে গেলাম। আমাদের পৈতৃক ভিটার নিতান্ত দুরবস্থা দেখিয়া মনে করিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমার ধনরত্নে কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই গরিবরা তো গৃহী, সেই গুপ্ত সম্পদ ইহাদের জন্য উদ্ধার করিয়া দিলে তাহাতে দোষ নাই।
"সেই লিখন কোথায় আছে জানিতাম, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইল না।
"তাহার পরে একটি বৎসর ধরিয়া এই কাগজখানা লইয়া এই নির্জন বনের মধ্যে গণনা করিয়াছি

আর সন্ধান করিয়াছি। মনে আর কোনো চিন্তা ছিল না। যত বারম্বার বাধা পাইতে লাগিলাম ততই উত্তরোত্তর আগ্রহ আরো বাড়িয়া চলিল-- উন্মত্তের মতো অহোরাত্র এই এক অধ্যবসায়ে নিবিষ্ট রহিলাম।

"ইতিমধ্যে কখন তুমি আমার অনুসরণ করিতেছ তাহা জানিতে পারি নাই। আমি সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনোই নিজেকে আমার কাছে গোপন রাখিতে পারিতে না ; কিন্তু আমি তন্ময় হইয়া ছিলাম, বাহিরের ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

"তাহার পরে, যাহা খুঁজিতেছিলাম আজ এইমাত্র তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। এখানে যাহা আছে পৃথিবীতে কোনো রাজরাজেশ্বরের ভাণ্ডারেও এত ধন নাই। আর একটিমাত্র সংকেত ভেদ করিলেই সেই ধন পাওয়া যাইবে।

"এই সংকেতটিই সর্বাপেক্ষা দুরূহ। কিন্তু এই সংকেতও আমি মনে মনে ভেদ করিয়াছি। সেইজন্যই 'পাইয়াছি' বলিয়া মনের উল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। যদি ইচ্ছা করি তবে আর-এক দণ্ডের মধ্যে সেই স্বর্ণমাণিক্যের ভাণ্ডারের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারি।"

মৃত্যুঞ্জয় শংকরের পা ড়জাইয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি সন্ন্যাসী, তোমার তো ধনের কোনো প্রয়োজন নাই-- আমাকে সেই ভাণ্ডারের মধ্যে লইয়া যাও। আমাকে বঞ্চিত করিয়ো না।"

শংকর কহিলেন, "আজ আমার শেষ বন্ধন মুক্ত হইয়াছে। তুমি ঐ-যে পাথর ফেলিয়া আমাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলে, তাহার আঘাত আমার শরীরে লাগে নাই, কিন্তু তাহা আমার মোহবরণকে ভেদ করিয়াছে। তৃষ্ণার করালমূর্তি আজ আমি দেখিলাম। আমার গুরু পরমহংসদেবের নিগূঢ় প্রশান্ত হাস্য এতদিন পরে আমার অন্তরের কল্যাণদীপে অনির্বাণ আলোকশিখা জ্বালাইয়া তুলিল।"

মৃত্যুঞ্জয় শংকরের পা ধরিয়া পুনরায় কাতর স্বরে কহিল, "তুমি মুক্ত পুরুষ, আমি মুক্ত নহি, আমি মুক্তি চাহি না, আমাকে এই ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস, তবে তুমি তোমার এই লিখনটি লও। যদি ধন খুঁজিয়া লইতে পার তবে লইয়ো।"

এই বলিয়া তাঁহার যষ্টি ও লিখনপত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে রাখিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমাকে দয়া করো, আমাকে ফেলিয়া যাইয়ো না-- আমাকে দেখাইয়া দাও।"

কোনো উত্তর পাইল না।

তখন মৃত্যুঞ্জয় যষ্টির উপর ভর করিয়া হাতড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পথ অত্যন্ত জটিল, গোলকধাঁধার মতো, বারবার বাধা পাইতে লাগিল। অবশেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া এক জায়গায় শুইয়া পড়িল এবং নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

ঘুম হইতে যখন জাগিল তখন রাত্রি কি দিন কি কত বেলা তাহা জানিবার কোনো উপায় ছিল না। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইলে মৃত্যুঞ্জয় চাদরের প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া খাইল। তাহার পর আর-একবার হাতড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। নানা স্থানে বাধা পাইয়া বসিয়া পড়িল। তখন চিৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো সন্ন্যাসী, তুমি কোথায়।"

তাহার সেই ডাক সুরঙ্গের সমস্ত শাখাপ্রশাখা হইতে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনতিদূর হইতে উত্তর আসিল, "আমি তোমার নিকটেই আছি-- কী চাও বলো।"

মৃত্যুঞ্জয় কাতরস্বরে কহিল, "কোথায় ধন আছে আমাকে দয়া করিয়া দেখাইয়া দাও।"

তখন আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মৃত্যুঞ্জয় বারম্বার ডাকিল, কোনো সাড়া পাইল না।

দণ্ডপ্রহারের দ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাত্রির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর-একবার ঘুমাইয়া লইল। ঘুম হইতে আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। চিৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো, আছ কি।"

নিকট হইতেই উত্তর পাইল, "এইখানেই আছি। কী চাও।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমি আর-কিছু চাই না-- আমাকে এই সুরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া

যাও।”
সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি ধন চাও না ?”
মৃত্যুঞ্জয় কহিল, “না, চাহি না।”
তখন চক্‌মকি ঠোকার শব্দ উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বলিল।
সন্ন্যাসী কহিলেন, “তবে এসো মৃত্যুঞ্জয়, এই সুরঙ্গ হইতে বাহিরে যাই।”
মৃত্যুঞ্জয় কাতরস্বরে কহিল, “বাবা, নিতান্তই কি সমস্ত ব্যর্থ হইবে। এত কষ্টের পরেও ধন কি পাইব না।”
তৎক্ষণাৎ মশাল নিবিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, “কী নিষ্ঠুর।” বলিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। সময়ের কোনো পরিমাণ নাই, অন্ধকারের কোনো অন্ত নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল তাহার সমস্ত শরীর-মনের বলে এই অন্ধকারটাকে ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। আলোক আকাশ আর বিশ্বচ্ছবির বৈচিত্র্যের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কহিল, “ওগো সন্ন্যাসী, ওগো নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী, আমি ধন চাই না, আমাকে উদ্ধার করো।”
সন্ন্যাসী কহিলেন, “ধন চাও না ? তবে আমার হাত ধরো। আমার সঙ্গে চলো।”
এবারে আর আলো জ্বলিল না। এক হাতে যষ্টি ও এক হাতে সন্ন্যাসীর উত্তরীয় ধরিয়া মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া অনেক আঁকাবাঁকা পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া এক জায়গায় আসিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, “দাঁড়াও।”
মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইল। তাহার পরে একটা মরিচা-পড়া লোহার দ্বার খোলার উৎকট শব্দ শোনা গেল।
সন্ন্যাসী মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, “এসো।”
মৃত্যুঞ্জয় অগ্রসর হইয়া যেন একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আবার চক্‌মকি ঠোকার শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন মশাল জ্বলিয়া উঠিল, তখন, এ কী আশ্চর্য দৃশ্য ! চারি দিকে দেয়ালের গায়ে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগর্ভরুদ্ধ কঠিন সূর্যালোকপুঞ্জের মতো স্তরে স্তরে সজ্জিত। মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল। সে পাগলের মতো বলিয়া উঠিল, “এ সোনা আমার-- এ আমি কোনোমতেই ফেলিয়া যাইতে পারিব না।”
সন্ন্যাসী কহিলেন, “আচ্ছা, ফেলিয়া যাইয়ো না ; এই মশাল রহিল-- আর এই ছাতু, চিঁড়া আর বড়ো এক ঘটি জল রাখিয়া গেলাম।”
দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী বাহির হইয়া আসিলেন, আর এই স্বর্ণভাণ্ডারের লৌহদ্বারে কপাট পড়িল।
মৃত্যুঞ্জয় বারবার করিয়া এই স্বর্ণপুঞ্জ স্পর্শ করিয়া ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোটো ছোটো স্বর্ণখণ্ড টানিয়া মেজের উপর ফেলিতে লাগিল, কোলের উপর তুলিতে লাগিল, একটার উপরে আর-একটা আঘাত করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গের উপর বুলাইয়া তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সোনার পাত বিছাইয়া তাহার উপর শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।
জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, চারি দিকে সোনা ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। সোনা ছাড়া আর কিছুই নাই।
মৃত্যুঞ্জয় ভাবিতে লাগিল, পৃথিবীর উপরে হয়তো এতক্ষণে প্রভাত হইয়াছে, সমস্ত জীবজন্তু আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে। -- তাহাদের বাড়িতে পুকুরের ধারের বাগান হইতে প্রভাতে যে একটি স্নিগ্ধ গন্ধ উঠিত তাহাই কল্পনায় তাহার নাসিকায় যেন প্রবেশ করিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট চোখে দেখিতে পাইল, পাতিহাঁসগুলি দুলিতে দুলিতে কলরব করিতে করিতে সকালবেলায় পুকুরের জলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, আর বাড়ির ঝি বামা কোমরে কাপড় চড়াইয়া ঊর্ধ্বোত্থিত দক্ষিণহস্তের উপর একরাশি পিতলকাঁসার থালা বাটি লইয়া ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।
মৃত্যুঞ্জয় দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল, “ওগো সন্ন্যাসীঠাকুর, আছ কি।”
দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী কহিলেন, “কী চাও।”
মৃত্যুঞ্জয় কহিল, “আমি বাহিরে যাইতে চাই-- কিন্তু সঙ্গে এই সোনার দুটো-একটা পাতও কি

লইয়া যাইতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া নূতন মশাল জ্বালাইলেন-- পূর্ণকমণ্ডলু একটি রাখিলেন আর উত্তরীয় হইতে কয়েক মুষ্টি চিঁড়া মেজের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় পাতলা একটা সোনার পাত লইয়া তাহা দোমড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। সেই খণ্ড সোনাগুলোকে লইয়া ঘরের চারি দিকে লোষ্ট্রখণ্ডের মতো ছড়াইতে লাগিল। কখনো বা দাঁত দিয়া দংশন করিয়া সোনার পাতের উপর দাগ করিয়া দিল। কখনো বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে বারম্বার পদাঘাত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, পৃথিবীতে এমন সম্রাট কয়জন আছে যাহারা সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে। মৃত্যুঞ্জয়ের যেন একটা প্রলয়ের রোখ চাপিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই রাশীকৃত সোনাকে চূর্ণ করিয়া ধূলির মতো সে ঝাঁটা দিয়া ঝাঁট দিয়া উড়াইয়া ফেলে-- আর এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত সুবর্ণলুব্ধ রাজা-মহারাজকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে।

এমনি করিয়া যতক্ষণ পারিল মৃত্যুঞ্জয় সোনাগুলোকে লইয়া টানাটানি করিয়া শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম হইতে উঠিয়া সে আবার তাহার চারি দিকে সেই সোনার স্তূপ দেখিতে লাগিল। সে তখন দ্বারে আঘাত করিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো সন্ন্যাসী, আমি এ সোনা চাই না-- সোনা চাই না!"

কিন্তু দ্বার খুলিল না। ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুঞ্জয়ের গলা ভাঙিয়া গেল, কিন্তু দ্বার খুলিল না-- এক-একটা সোনার পিণ্ড লইয়া দ্বারের উপর ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল, কোনো ফল হইল না। মৃত্যুঞ্জয়ের বুক দমিয়া গেল-- তবে আর কি সন্ন্যাসী আসিবে না। এই স্বর্ণকারাগারের মধ্যে তিলে তিলে পলে পলে শুকাইয়া মরিতে হইবে!

তখন সোনাগুলাকে দেখিয়া তাহার আতঙ্ক হইতে লাগিল। বিভীষিকার নিঃশব্দ কঠিন হাস্যের মতো ঐ সোনার স্তূপ চারি দিকে স্থির হইয়া রহিয়াছে-- তাহার মধ্যে স্পন্দন নাই, পরিবর্তন নাই-- মৃত্যুঞ্জয়ের যে হৃদয় এখন কাঁপিতেছে, ব্যাকুল হইতেছে, তাহার সঙ্গে উহাদের কোনো সম্পর্ক নাই, বেদনার কোনো সম্বন্ধ নাই। এই সোনারপিণ্ডগুলা আলোক চায় না, আকাশ চায় না, বাতাস চায় না, প্রাণ চায় না, মুক্তি চায় না। ইহারা এই চির-অন্ধকারের মধ্যে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া কঠিন হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে।

পৃথিবীতে এখন কি গোধূলি আসিয়াছে। আহা, সেই গোধূলির স্বর্ণ! যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়। তাহার পরে কুটিরের প্রাঙ্গণতলে সন্ধ্যাতারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গোষ্ঠে প্রদীপ জ্বালাইয়া বধূ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরতির ঘন্টা বাজিয়া ওঠে।

গ্রামের ঘরের অতি ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম ব্যাপার আজ মৃত্যুঞ্জয়ের কল্পনাদৃষ্টির কাছে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের সেই-যে ভোলা কুকুরটা লেজে মাথায় এক হইয়া উঠানের প্রান্তে সন্ধ্যার পর ঘুমাইতে থাকিত, সে কল্পনাও তাহাকে যেন ব্যথিত করিতে লাগিল। ধারাগোল গ্রামে কয়দিন সে যে মুদির দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল সেই মুদি এতক্ষণ রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে গ্রামে বাড়িমুখে আহার করিতে চলিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, মুদি কী সুখেই আছে। আজ কী বার কে জানে। যদি রবিবার হয় তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে যার আপন আপন বাড়ি ফিরিতেছে, সঙ্গচ্যুত সাথিকে ঊর্ধ্বস্বরে ডাক পাড়িতেছে, দল বাঁধিয়া খেয়ানৌকায় পার হইতেছে; মেঠো রাস্তা ধরিয়া, শস্যক্ষেত্রের আল বাহিয়া, পল্লীর শুষ্কবংশপত্রখচিত অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া চাষী লোক হাতে দুটো-একটা মাছ ঝুলাইয়া মাথায় একটা চুপড়ি লইয়া অন্ধকারে আকাশভরা তারার ক্ষীণালোকে গ্রামে গ্রামান্তরে চলিয়াছে।

ধরণীর উপরিতলে এই বিচিত্র বৃহৎ চিরচঞ্চল জীবনযাত্রার মধ্যে তুচ্ছতম দীনতম হইয়া নিজের জীবন মিশাইবার জন্য শতস্তর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহার কাছে লোকালয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিতে

লাগিল। সেই জীবন, সেই আকাশ, সেই আলোক, পৃথিবীর সমস্ত মণিমাণিক্যের চেয়ে তাহার কাছে দুর্মূল্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, কেবল ক্ষণকালের জন্য একবার যদি আমার সেই শ্যামাজননী ধরিত্রীর ধূলিক্রোড়ে, সেই উন্মুক্ত আলোকিত নীলাম্বরের তলে, সেই তৃণপত্রের গন্ধবাসিত বাতাস বুক ভরিয়া একটিমাত্র শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেও জীবন সার্থক হয়।

এমন সময় দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, কী চাও।"

সে বলিয়া উঠিল, "আমি আর কিছুই চাই না-- আমি এই সুরঙ্গ হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকধাঁধা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে, বাহির হইতে চাই। আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি চাই।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে মূল্যবান রত্নভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না ?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, যাইব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "একবার দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও নাই ?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে যদি কৌপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় তবু আমি এখানে এক মুহূর্তও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আচ্ছা, তবে এসো।"

মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে সেই গভীর কূপের সম্মুখে লইয়া গেলেন। তাহার হাতে সেই লিখনপত্র দিয়া কহিলেন, "এখানি লইয়া তুমি কী করিবে।"

মৃত্যুঞ্জয় সে পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল।